‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত’

অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। আমেরিকার ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. আলী রীয়াজ সম্প্রতি দেশে এসেছিলেন। সেসময় তিনি *সাপ্তাহিক*-এর সাথে কথা বলেছেন সমকালীন রাজনীতি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, জঙ্গিবাদী প্রবণতা ও তার প্রতিরোধ, ইসলামি মিলিট্যান্সির বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতি, গণতন্ত্র, উন্নয়নসহ বিবিধ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন **শুভ কিবরিয়া** ও **সায়েম সাবু**

সাপ্তাহিক : বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার ঘটনাও ঘটছে, আবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে তা প্রতিরোধের চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রবণতা থামছে না। এই বিষয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে কোথায়? এ নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী।

আলী রীয়াজ : শুধুমাত্র জঙ্গি ইস্যু দিয়ে বিচার করলে আপনি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক চিত্র মূল্যায়ন করতে পারবেন না।

মূলধারার রাজনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, বৈশ্বিক সংযুক্তি নিয়েই আপনাকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে। এসব বিষয় আমলে এনেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত।

এগুলো কোনোটিই বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এর প্রতিটিই একে অপরের সঙ্গে গ্রথিত। আমার উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, মূলধারার রাজনীতি। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে, তাতে জনগণের আস্থা অত্যন্ত কমে গেছে।

এখন যে কোনো বিষয় নিয়েই মানুষ সন্দেহ করে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকার কথা। তা নেই দীর্ঘকাল ধরে। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যে জায়গা অর্থাৎ কথা বলা, ভিন্ন মত প্রকাশের জায়গাগুলো সংকুচিত হচ্ছে এবং তা মারাত্মকভাবে হচ্ছে। গণমাধ্যমগুলো এক ধরনের সেন্সরশিপের (নিয়ন্ত্রিত) মধ্য দিয়ে চলছে।

অন্যদিকে জঙ্গি নিয়ে এক অর্থে এক প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক জিইয়ে রয়েছে। এ বিতর্ক হচ্ছে আইএস (ইসলামিক স্টেট) আছে, আইএস নাই প্রসঙ্গে। সবার আগে বুঝতে হবে, আইএস তো কোনো ব্যক্তি না। আইএস হচ্ছে একটি আদর্শ। এই আদর্শে যারা অনুপ্রাণিত তারা তো রয়ে গেছেন।

তার মানে বিপদটা তো আছে। এই বিপদ আপনি মোকাবিলা করবেন কীভাবে? এমন বিপদ মোকাবিলা করার জন্য সর্বাত্মক কৌশল দরকার। এই কৌশল শুধুমাত্র নিরাপত্তা অভিযান নয়। এর সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বের করা এবং তা মোকাবিলা করা দরকার।

অন্যের দিকে আঙ্গুল তুলে ধরলেই সমাধানের পথ বের হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কীভাবে সম্ভব? সবার আগে গণতান্ত্রিক জায়গা তৈরি করে দিতে হবে।

সাপ্তাহিক : গণতান্ত্রিক স্পেস নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। সেই প্রশ্নে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা?

আলী রীয়াজ : আমরা তো অনিশ্চিয়তার মধ্যেই আছি। বাংলাদেশের

২০ এপ্রিল ২০১৭ | সাপ্তাহিক
১

সামগ্রিক বিবেচনা আমলে নিয়ে আপনি কোন বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়তা প্রকাশ করতে পারবেন, বলুন? যে বিষয়গুলো নিশ্চিত থাকার কথা, সেগুলো নিয়েও তো বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বলি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। ব্যাংকিং সেক্টরে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তাতে কি এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হবে? রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমেছে। তাহলে অবশ্যই সেখানে কিছু একটা ঘটেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, তাতে করে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

রাজনীতিতে কী হবে সামনে? প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন ২০১৪ সালের মতো নির্বাচন আর চান না। তাহলে অবশ্যই সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচন দরকার। কিন্তু তার ব্যবস্থা কি নেয়া হচ্ছে? নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার কি কোনো পথ তৈরি হয়েছে?

প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হয়ে বিভিন্ন সমাবেশে গিয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট চাইছেন। অন্যরা কি এই সুবিধা পাচ্ছেন? প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের যে অভিযান শুরু করেছেন, অন্যরা তো সে অভিযানে নামতে পারছেন না।

এই সমস্ত কারণে যেগুলো নিশ্চিত বিষয়, তা নিয়ে তো প্রশ্ন আছে। অনিশ্চয়তা তো সর্বত্রই। সমাজে বৈষম্য বাড়ছে, দ্বন্দ্ব বাড়ছে।

সাপ্তাহিক : এমন অনিশ্চয়তা তো পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও তা আছে।

আলী রীয়াজ : সেখানে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, সেই অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার। বাংলাদেশে কি এখন এমন প্রতিষ্ঠানের উপর ভরসা রাখা যায়?

যুক্তরাষ্ট্রে কবে নির্বাচন হবে, তা এখনই বলে দেয়া যায়। দিন তারিখ ধরেই বলা যেতে পারে। সেখানে মানুষ চাইলে নেতৃত্বের পরিবর্তন করতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যা করতে চাইছেন, তার কি সবই করতে পারছেন? আদালত তো আটকে দিল তার অনেক নির্বাহী আদেশ।

সাপ্তাহিক : তাহলে কি এটি গণতন্ত্রের সুফল। অন্তত কিছু কিছু জায়গায় চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়?

আলী রীয়াজ : চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ছাড়া আপনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই পারবেন না। গণতন্ত্রে মৌলিক বিষয় হচ্ছে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স।

প্রথমত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য, দ্বিতীয়ত সুশীল সমাজের নজরদারি এবং সর্বশেষ মিডিয়ায় সমালোচনা। এই তিনটি বিষয় যুক্তরাষ্ট্রে

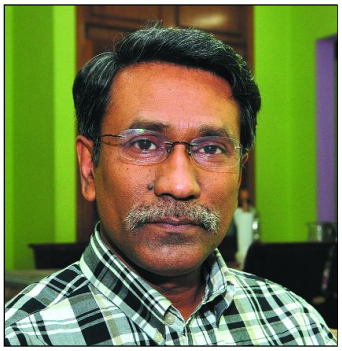

ভারত অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশকে বিবেচনায় নিচ্ছে। এটি ভারতের স্বার্থ। একইভাবে বাংলাদেশকেও তার স্বার্থ নিয়ে ভাবতে হবে। ভারত এবং চীনের প্রক্সিওয়ারের ক্ষেত্র যদি হয় বাংলাদেশ, তাহলে তো এটি বিপজ্জনক হবে। জাতীয় স্বার্থেই এই প্রবণতা বিপদজ্জনক। কারণ এমন যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশ নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না। কোনো না কোনো পক্ষে যুক্ত হতে হবে। এ কারণেই ভূ-রাজনৈতিক কৌশল আমলে নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ বাংলাদেশকেই দেখতে হবে

.....

শক্তিশালী অবস্থানে আছে বলেই মনে করা হয়। যারা নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়ন করেন তাদের মধ্যেও চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স মেনে চলতে হয়। যে আইন রয়েছে সেখানে, তার বাইরে অনেক কিছুই করতে পারবেন না তারা। কারণ শেষ পর্যন্ত তাকে আইন মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের কারণেই এই ধারা তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যত্রও তাই। যুক্তরাষ্ট্রের দেড়শ বছরের গণতন্ত্রের ইতিহাস হচ্ছে সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তা বলছি না। কিন্তু শক্তিশালী হওয়ার কারণে অনেক কিছুই মোকাবিলা করতে পারে।

আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিকে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা বলি। এ নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে চেক দেওয়ার মতো প্রতিষ্ঠান সেখানে আছে।

সাপ্তাহিক : আপনি বলছেন, সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এরপরেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো কর্তৃত্ববাদী শাসক তৈরি হচ্ছে কেন? ভারতেও তাই দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি গণতন্ত্রের মধ্যেও সমস্যা আছে?

আলী রীয়াজ : এর দুটি কারণ আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর থাকার পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে। অংশগ্রহণমূলক যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আছেই বটে। এ কারণে সমাজের কিছু মানুষ এখনও মনে করে, তারা মূলধারার বাইরে আছেন। তাদের অংশগ্রহণ নেই। ফলে এই নির্বাচন বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষোভটা তারা প্রকাশ করেছে।

আর সেই ক্ষোভটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে কর্তৃত্ববাদী শাসকরা। পুতিন বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম, দুতার্তে বলেন- সবাই এই ক্ষোভকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন।

গণতন্ত্র আসলে একদিন বা নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা নয়। এটি প্রতিদিনের ঘটনা। আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় এখনও শেষ হয়নি। সেখানে রেড ইন্ডিয়ান, স্প্যানিস, এশিয়ান এবং দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে তা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

সাপ্তাহিক : গণতন্ত্র চর্চার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সুফল সেখানে আছে , আপনি বলতে চাইছেন ।

আলী রীয়াজ : হ্যাঁ। গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিদিনের সংগ্রামের ফসল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাপার নয় যে, আজ প্রতিষ্ঠা হলো আর সব ঠিক হয়ে গেল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তির জায়গাই এটি যে, তা আপনাকে প্রতিদিন সংগ্রাম করার জায়গাটি দেয়।

সাপ্তাহিক : তার মানে এই জায়গা বন্ধ হয়ে গেলেই বিপদ।

আলী রীয়াজ : এই সংগ্রামের জায়গা বন্ধ করে দিয়েই তো কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা জারি করতে হয়। তখন শক্তি প্রয়োগের নীতিই হয় একমাত্র উপায়।

সাপ্তাহিক : আপনি ইসলামি মিলিট্যান্সি নিয়ে কাজ করছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি, জঙ্গিবাদের সঙ্গে নারী এবং আত্মঘাতী প্রবণতা প্রসঙ্গটি সামনে আসছে। আমরা সরকারি তরফে অভিযান

২০ এপ্রিল ২০১৭ | সাপ্তাহিক ২

দেখছি। আবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক লোকজন উঠিয়ে নেয়ার অভিযোগের ঘটনাও ঘটছে। এমন নানা রকম প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার এ নিয়ে নানা প্রশ্নও উঠছে। আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

আলী রীয়াজ : প্রশ্ন ওঠার যৌক্তিক কারণ হচ্ছে অতীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কাউকে আটক করলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকে। কিন্তু এটি এখন আর হচ্ছে না। লাশ পড়ে থাকে অথবা ক্রসফায়ারে মারা যায়, আর নিহতের পরিবার দাবি করে দুই কি তিন সপ্তাহ আগে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গত পাঁচ বছরে এই ঘটনাগুলো উপর্যুপরি ঘটেছে। বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা, গুম ঘটছেই। এ কারণে যে কোনো প্রশ্নই এখন মানুষের কাছে বিশ্বাসে রূপ নিচ্ছে।

এই ব্যবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সহিংস উগ্রপন্থাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। কারণ যারা এই ধরনের উগ্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সমাজ নিয়ে নানা সংশয় থাকার কারণে উগ্রবাদীদের আবেদন কারও কারও কাছে তখন বিশ্বাসযোগ্যতা পায় বা পেতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, জঙ্গিবাদ মোকাবিলা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। সমাজের মধ্যে নানা উগ্রবাদী প্রবণতা থাকলে আপনি শুধু জঙ্গিবাদের প্রবণতাকে মোকাবিলা করতে পারবেন না।

জাতীয়তাবাদ, জাতীয় নিরাপত্তার নামে, জাতীয় উন্নয়নের নামেও উগ্রবাদ বিস্তার লাভ করতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা তাই দেখেছি। গোটা দক্ষিণ আমেরিকাতেও আমরা এমনটি লক্ষ্য করেছি। সেখানকার পরিণতিও দেখেছি।

উগ্রবাদ মোকাবিলা করার উপায় হচ্ছে, সবগুলোকে আমলে নিয়ে মোকাবিলা করা। এরমধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে আপনি অভিযানও চালাতে পারেন, সামরিক শক্তি প্রয়োগও করতে পারেন। এতে করে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে।

সাপ্তাহিক : আপনি বলতে চাইছেন, উগ্রবাদের পরিণতি পৃথিবীর কোথাও ভালো হয়নি। আসলে খারাপ কি হয়েছে?

আলী রীয়াজ : দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলিতে কত দীর্ঘ সময় ধরে কত হাজার হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হলো। উন্নয়ন এবং জাতীয় নিরাপত্তার নামেই এটি হয়েছে। মেক্সিকোতে ওয়ার অ্যান্ড ড্রাগের নামে অন্তত ৬০ হাজার মানুষ মারা গেছে। কোরিয়াতে তাই দেখলাম।

এই প্রবনতা দীর্ঘমেয়াদে মানুষের যে সামগ্রিক উন্নয়ন, তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। উন্নয়ন বলতে আমি শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই বলছি না। মানবিকভাবে উন্নয়নটা অর্জন করতে হবে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে সিআরপি বসিয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা করা হলো, গুম করা হলো, তাতে করে পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক পরিবর্তনের যে ধারা তা তো ব্যাহত হয়েছে। এর কিছু কিছু পরিণতি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তাই দেখলাম। কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা মিসরেও দেখলাম। মিসর আপাতত শান্ত মনে হচ্ছে। আসলে মিসরের পরিস্থিতি শান্ত নয়। বিপদ আপাতত কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

জোর করে কোনো কিছুরই সমাধান হয় না। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার যুদ্ধ। ২০০১ সালের পর মানুষ শুধু যুদ্ধ দেখছে। কোনো সমাধান দেখতে পায়নি।

আদর্শকে শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। আদর্শকে আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়। এই মোকবিলায় সকলকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। বিতর্কের সুযোগ থাকতে হবে।

সাপ্তাহিক : আমাদের এখানেও উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। দৃশ্যমান উন্নয়ন আমরা দেখতেও পাচ্ছি। এই উন্নয়নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান নিয়ে কি বলবেন?

আলী রীয়াজ : আমরা জানতাম, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়। মধ্যবিত্তরা তখন নিজেদের শাসনের অংশ মনে করতে থাকে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

কিন্তু আমরা এখন উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে যে সব দেশে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, সে সব দেশ ক্রমাগতভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে যাচ্ছে। পরিবর্তন একদিকে হওয়ার কথা, হচ্ছে আরেক দিকে।

ফিলিপাইন, তুরস্ক এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই এমনটি দেখতে পেলাম। মধ্যবিত্ত নির্ধারণ করাও এখন কঠিন হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের সঙ্গে যারা জড়িয়ে পড়ছেন, তাদের অনেকেই উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা। তবে আমি এ নিয়ে বিস্মিত না। নতুন মধ্যবিত্ত যারা হচ্ছেন, তারা ধর্মাচরণ দেখানোর চেষ্টা করছেন। ধর্মের পাবলিক ব্যবহারে তারা জোর দিচ্ছেন।

কিন্তু ওই পরিবারে যে তরুণ বেড়ে উঠছে সে কি দেখছে? সে দেখছে তার বাবা এক ধরনের দুর্নীতির মধ্য দিয়ে এই অর্থ অর্জন করছে। আবার সেই অর্থকে বৈধতা দেয়া হচ্ছে ধর্ম-কর্ম পালনের মধ্য দিয়ে। তখন ওই তরুণদের কাছে আল কায়েদা বা আইএস উপস্থিত হয়। ঘরে বসেই তারা আইএস বা আল কায়েদার ব্যাপারে ধারণা নিতে পারে।

আর্থিকভাবে মধ্যবিত্ত হলেও কতগুলো মূল্যবোধের ব্যাপার গুরুত্ব পাওয়ার কথা। সাংস্কৃতিক চর্চা, অন্যকে সম্মান করার চর্চার মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পাওয়ার কথা। এখন যারা দ্রুত মধবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে তাদের মধ্যে এই মূল্যবোধের ঘাটতি রয়েছে।

আমার কাছে মনে হয়েছে সমাজে ধর্মের প্রকাশ্য রূপটিই গুরুত্ব পাচ্ছে এবং অন্যান্য মূল্যবোধের চর্চার অভাব রয়েছে। গণতন্ত্র এবং সকলের অংগ্রহণমূলক রাজনীতি নিয়ে এক প্রকার অনিশ্চিয়তা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই প্রবণতাগুলোই এ দেশে জঙ্গি তৈরির আবেদন হিসেবে দেখতে পাই।

সাপ্তাহিক : দুর্নীতির সঙ্গে কি জঙ্গি উত্থানের কোনো সম্পর্ক আছে?

আলী রীয়াজ : অবশ্যই আছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি দেখিয়েছে যে, কীভাবে দুর্নীতির অর্থ হাত-বদল হয়।

আমি আইএস-এর ভিডিও থেকে দেখেছি, তারা সবসময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে। সবাই দুর্নীতি করতে চায় না। কিন্তু কারও কারও দুর্নীতির কারণে অন্যজন বঞ্চিত হচ্ছে। তখন তার মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। সহজেই সেই ক্ষোভকে কাজে লাগানো যায়।

বামপন্থিরা এক সময় বলত, সমাজে বৈষম্যের কারণে এমনটি হচ্ছে। আর উগ্রবাদীরা সরাসরি বলছে, দুর্নীতির কারণে এসব হচ্ছে। দুর্নীতি ছাড়া এমন সম্পদ কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তখন তারা একটি সহজ পন্থায় সমাধান চায়। তবে এই সহজ পন্থা কিন্তু কোনো সমাধান নয়।

আবার আমেরিকার ট্রাম্প বা ফিলিপাইনের দুতার্তে যে সমাধানের কথা বলেন, সেটাও কোনো সঠিক পথ নয়। এই দ্বিধার মধ্য থেকে কেউ ট্রাম্পদের সমাধান গ্রহণ করে, কেউ আবার আইএস-এর সমাধান নিতে চায়।

এ কারণেই সমাধানের পথ ভেতর থেকেই বের করতে হয়। যাতে করে এই ধরনের রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।

সাপ্তাহিক : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করে এলেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক হলো। এই মুহূর্তে প্রতিরক্ষা সমঝোতা আসলে কতটুকু জরুরি ছিল? আপনার কাছে কি মনে হয়?

আলী রীয়াজ : সবার আগে দেখতে হবে এই সমঝোতার প্রস্তাব করেছে কে? বাংলাদেশ তো এই সমঝোতার প্রস্তাব

২০ এপ্রিল ২০১৭ | সাপ্তাহিক
৩

করেনি। ভারত করেছে।

সাপ্তাহিক : বাংলাদেশে তো এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সরকারের লোকেরাও নানা কথা বললেন এই সমঝোতা নিয়ে?

আলী রীয়াজ : এই সমঝোতা বাংলাদেশের প্রয়োজনে হয়নি। বাংলাদেশের প্রয়োজনে হলে তো বাংলাদেশই প্রস্তাব করত। আমি অন্তত তাই মনে করি।

বাংলাদেশ যদি বিপদগ্রস্ত হতো অথবা একটি যুদ্ধের আশঙ্কা থাকত অথবা বাংলাদেশের সীমান্তে ঝুঁকি রয়েছে, তাহলে বাংলাদেশ এমন প্রস্তাব করতেই পারত। কিন্তু তা হয়নি। ভারতের পক্ষ থেকে চাইছে বলেই এই সমঝোতা হয়েছে।

যে বিষয়টি বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই, সেটি বাস্তবায়নের জন্য এত তাড়াহুড়ার দরকার কেন?

বাংলাদেশের তুলনা করলে এমনিতেই নানা অসমতা সামনে আসে। ভারত অনেক বড় রাষ্ট্র। লোকসংখ্যা অনেক বেশি। ক্ষমতা বেশি। ভারতের অর্থনৈতিক আকার বিশাল।

এই অবস্থায় যে সব প্রশ্নে অন্তত সমতাটা বজায় রাখা যাবে, সে সব বিষয়ে তো কোনো ছাড় দেয়ার উপায় নেই।

সাপ্তাহিক : আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের যে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তাতে বাংলাদেশ কী পেল? আমরা কতটুকু লাভবান হলাম?

প্রতিরক্ষা খাতে বাংলাদেশ-ভারত যে কাঠামোগত সমঝোতায় উপনীত হলো তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল কী হতে পারে?

আলী রীয়াজ : যে সব সমঝোতা থেকে এমন চুক্তি হয়ে আছে। তখন তো এমন আলোচনা হয়নি। ভারত বলেই কি এমন আলোচনা?

আলী রীয়াজ : ভারত প্রতিবেশী। চীন খানিক দূরত্বে। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও গুরুত্ব পায়, যা চীনের ক্ষেত্রে না। এ কারণে প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক।

সাপ্তাহিক : বৈশ্বিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর কী ব্যাখ্যা আপনার কাছে?

আলী রীয়াজ : ভূ-রাজনৈতিক এবং কৌশলগত কারণেই বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব অর্থনীতির বড় একটি অংশ এখন এশিয়ানির্ভর। এর মধ্যে দক্ষিণ

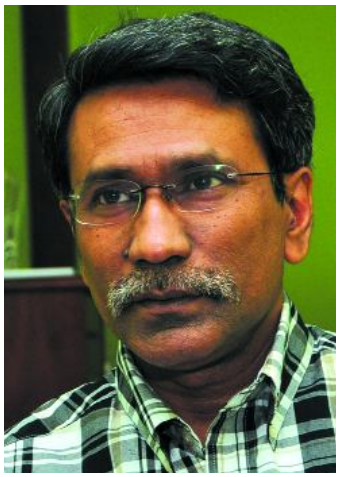

অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা থাকলে সকলেই তার লাভ বা ভাগের বিষয় দেখতে পায়। তখন এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সকলে কাজ করে। কিন্তু এখন সমাজে এক শ্রেণির মানুষ মনে করছে, যাই ঘটুক তা শুধুই আমার। এখানে অন্য কারও ভাগ থাকতে পারে না। তখন আর ন্যায্য আচরণ প্রকাশ পায় না। তবে এই অন্যায্য আচরণ কেউ না কেউ তো দেখছে। তখন অন্য কেউ যে কোনো উপায়ে তা প্রতিরোধ করতে চাইবে। সেই প্রতিরোধের ভাষা বা পথ যে গ্রহণযোগ্য হবে তা নয়

এশিয়া ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারত মহাসাগর এবং এই মহাসাগর থেকে ছড়িয়ে পড়া বঙ্গোপসাগর এই অর্থনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

এ কারণেই এ অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তি তাদের প্রভাব বলয়টি বৃদ্ধি করতে চাইছে। চীন, ভারত ও অন্যান্য শক্তি এখানে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখানে কি করবে ট্রাম্প আসার পর তা অনেকেটাই অনিশ্চিত।

অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত কৌশলগত যে পরিবর্তন তারই পরিবর্ধিত রূপ হচ্ছে বাংলাদেশ।

ভারত অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশকে বিবেচনায় নিচ্ছে। এটি ভারতের স্বার্থ। একইভাবে বাংলাদেশকেও তার স্বার্থ নিয়ে ভাবতে হবে।

ভারত এবং চীনের প্রক্সিওয়ারের ক্ষেত্র যদি হয় বাংলাদেশ, তাহলে তো এটি বিপজ্জনক হবে। জাতীয় স্বার্থেই এই প্রবণতা বিপদজ্জনক। কারণ এমন যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশ নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না। কোনো না কোনো পক্ষে যুক্ত

আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে তিস্তার পানি ইস্যুও। বলা হচ্ছে, তিস্তার পানি হলো না, তাহলে প্রতিরক্ষা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক কেন?

আমি মনে করি, তিস্তার পানি ইস্যুই একমাত্র সমাধান নয়। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতি, সীমান্ত হত্যা, গোটা বাংলাদেশ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে ফেলা হলো। এগুলো কি আলোচনার বিষয় নয়?

৫৪টি নদী ভারতের সঙ্গে। এক তিস্তা নিয়ে আলোচনা করার কি আছে? ফারাক্কা নিয়ে চুক্তি হয়েছে। এখন তো ফারাক্কা ভাঙার জন্য ভারতেই দাবি উঠেছে। ফারাক্কা নিয়েও আলোচনা করার দাবি রাখে। ভারত থেকে প্রচুর লোক এসে বাংলাদেশে কাজ করছে। বাংলাদেশিরা কি সে সুযোগ পায় ভারতে? সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কথা বলা হচ্ছে। এখানে কি বিনিময় হচ্ছে?

এরকম অনেক বিষয় আছে। শুধুমাত্র তিস্তার সমাধান হয়ে গেলেই সব ফুরিয়ে গেল না। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এমন সম্পর্ক থাকতেই হয়।

কিন্তু কূটনৈতিক আলোচনায় সম্পর্ক গুরুত্ব পায় সমতার প্রশ্নে। ভারতের সঙ্গে স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডিফেন্স কোঅপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক বা প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামো স্মারক; কিন্তু সরকারিভাবে এর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। ফলে দেশের মানুষ এর আওতায় কোন ক্ষেত্রে, কী বিষয়ে, কী মাত্রায় সহযোগিতা হবে তার কোনো ধারণা লাভ করতে পারছেন না; এই ধরনের অস্পষ্টতা সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ তৈরি করে।

সাপ্তাহিক : প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয় নিয়ে কোন দেশে আসলে প্রকাশ্যে আলোচনা হয়?

আলী রীয়াজ : চুক্তির মৌলিক বিষয় নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হয়। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা না করতেই পারেন। কিন্তু চুক্তির পটভূমিকাটা কী, কেন চুক্তির পরিস্থিতি তৈরি হলো, তা তো জনগণের জানার অধিকার আছে।

এই প্রতিরক্ষা সমঝোতা স্মারক নিয়ে আরও প্রশ্ন উঠেছে এই কারণে যে, সংসদে এ নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। নীতিগত জায়গা, বাংলাদেশ এই সমঝোতা থেকে কী লাভবান হলো সে আলোচনা তো নেই।

সাপ্তাহিক : চীনের সঙ্গে তো দীর্ঘদিন

২০ এপ্রিল ২০১৭ | সাপ্তাহিক
৪

হতে হবে।

এ কারণেই ভূ-রাজনৈতিক কৌশল আমলে নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ বাংলাদেশকেই দেখতে হবে।

সাপ্তাহিক : মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট না। যদিও দেশটির সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় রয়েছে। দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

আলী রীয়াজ : ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো মিয়ানমারও এখন গুরুত্বপূর্ণ। কৌশলগত কারণেই চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে মিয়ানমার এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি করেছে। এ কারণেই মিয়ানমারের নানা অপকর্মকে ওই দেশ দুটি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ কি তাহলে অমন একটি বলয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে কিনা? আমি তা মনে করি না। কারণ বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলাদা।

তাহলে বাংলাদেশ কী করবে? আমি মনে করি, মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ খোলামেলা আলোচনা করবে। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যে বিষয়ে আলোচনা করতে চায়, তা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন (জোট) গঠন করতে পারে। বাংলাদেশকে বোঝাতে হবে, এই বিপদ তোমাদেরও।

কিন্তু সেই আলোচনা হচ্ছে না। হচ্ছে না এই কারণে যে, মিয়ানমারের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, তার ভিত্তি বাংলাদেশের কাছে এখনও স্পষ্ট না।

মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপার আমি সমর্থন করি। কিন্তু এটিই একমাত্র সমাধান নয়। এই সমস্যার সমাধান কূটনৈতিকভাবেই করতে হবে। চীন, ভারত, রাশিয়া সবাইকে নিয়েই আলোচনা করতে হবে। একটি বলয়ে অবস্থান করে এই সমস্যার সমাধান মিলবে না।

সাপ্তাহিক : গত এক দশকে বাংলাদেশ অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে পার করল। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন, বিডিআর হত্যা, গণজাগরণ মঞ্চ ও হেফাজতের উত্থান দেখতে হলো। আবার উন্নয়নও দেখছে জনগণ। অন্যদিকে চলমান সংকট থেকে শঙ্কা বাড়ছে। এই দেশে অতীতে যারা দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তারা আবার বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখেও পড়েছে।

স্থিতিশীল এবং টেকসই উন্নয়নের পথ আসলে কোনটি?

আলী রীয়াজ : এই ধারা শুধু বাংলাদেশেই নয়। গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে নির্বাচনে জেতার পর এর ফলাফলের একটি নেতিবাচক ধারা রয়েছে। শুধুমাত্র পাশের দেশ ভারত বাদে। ভারতে দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসার পরেও প্রতিষ্ঠানগুলো সেই অর্থে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারতে রাজনৈতিক দলে বড় কোনো বিপর্যয় আসেনি।

কিন্তু অন্য দেশগুলোতে নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলাফলের ইতিহাস খুব ভালো না। এমন বিজয় সরকারগুলোকে চরম কর্তৃত্ববাদী করে তুলেছে। তখন আর চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স কাজ করে না। ক্ষমতাসীন দল মহাশক্তি নিয়ে হাজির হয়। আর এমন শক্তির বিপরীতেই বিপদ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই পথ থেকে বের হওয়ার উপায় হচ্ছে সকলের অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

সাপ্তাহিক : সকলের অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি গুরুত্ব পেলে তো জামায়াতে ইসলামি বা ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে জায়গায় দিতে হবে। গণতন্ত্রে কী সে সুযোগ দেয়া ঠিক হবে?

আলী রীয়াজ : বাংলাদেশের সংবিধান তো জামায়াতে ইসলামিকে রাজনীতি করতে বাধা দেয় না। নির্বাচন কমিশন জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করেছে। কিন্তু রাজনীতি করতে পারবে না, তা তো বলা হয়নি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ১৯৭২ সালের সংবিধানে ছিল না। কিন্তু পরিবর্তিত সংবিধানে তো এ ধারা আছে। সর্বশেষ সংশোধনীতেও বহাল রয়েছে।

কারও বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকলে, তা আইনে মোকাবিলা হবে। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে রাজনীতি করতে দিতে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের ওপর ভরসা রাখলে ভয় থাকার কথা নয়।

সাপ্তাহিক : জনগণের ওপর ভরসা রেখে তো ভারতে বিজেপির উত্থান ঘটল?

আলী রীয়াজ : ভারতে বিজেপির উত্থানের দুটি কারণ আছে বলে আমি মনে করি। এক হচ্ছে মধ্যবিত্তের হিসাব-নিকাশ এবং কংগ্রেসের অনিয়ম-দুর্নীতি ও কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব।

সবাইকে খেলতে দেয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র। ভালো করলে জনগণ সঙ্গে থাকবেই। জনগণের প্রতি ভরসা রাখা মানেই অন্ধ বিশ্বাস নয়। জনগণ কি চায় তা গুরুত্ব দিয়েই ভরসা রাখতে হয়।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয় গুরুত্ব পেলেই জনগণের প্রতি ভরসা রাখা যায়।

সাপ্তাহিক : তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিই সংকট উত্তরণের সমাধান।

আলী রীয়াজ : হ্যাঁ, সকলের অংশগ্রহণ আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। এর বাইরে কোনো উপায় দেখছি না। কেউ উপায় দেখাতেই পারেন। কিন্তু আমাকে কথা বলার অধিকারও দিতে হবে সেখানে।

অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা থাকলে সকলেই তার লাভ বা ভাগের বিষয় দেখতে পায়। তখন এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সকলে কাজ করে। কিন্তু এখন সমাজে এক শ্রেণির মানুষ মনে করছে, যাই ঘটুক তা শুধুই আমার। এখানে অন্য কারও ভাগ থাকতে পারে না। তখন আর ন্যায্য আচরণ প্রকাশ পায় না। তবে এই অন্যায্য আচরণ কেউ না কেউ তো দেখছে। তখন অন্য কেউ যে কোনো উপায়ে তা প্রতিরোধ করতে চাইবে। সেই প্রতিরোধের ভাষা বা পথ যে গ্রহণযোগ্য হবে তা নয়।

সাপ্তাহিক : ইসলামি মিলিট্যান্সি নিয়ে নানা কথা আছে। আপনি একাডেমিকভাবে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। বাংলাদেশে ইসলামি মিলিট্যান্সি নিয়ে আসলে কী হচ্ছে? এর ভবিষ্যৎ কী?

আলী রীয়াজ : এটি বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এটি মূলধারার রাজনীতির সঙ্গেই জড়িত। কোনো বিশেষ দলের সঙ্গে মিলিয়ে আমি বলছি না।

সকলের অংশগ্রহণ না নিয়ে আপনি যদি বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে এই শক্তিকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন, তাহলে পারবেন না। এতে করে আমরা এই শক্তির ক্রমাগতভাবে রূপ পরিবর্তন দেখব। ইসলামি মিলিট্যান্সি মোকাবিলা করতে হলে সবার আগে মূলধারার রাজনীতির মধ্যকার সমস্যা সমাধান করতে হবে। মিলিট্যান্সি আগেও ছিল। বামপন্থিদের মধ্যেও ছিল। এটি থাকবেই। থাকাটাই স্বাভাবিক। একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় থাকে।

সাপ্তাহিক : আলোচনাটি আমরা শেষ করব। এখন জানতে চাইব আপনি থাকেন আমেরিকায়। শত ব্যস্ততা। এর মধ্যে আপনি বাংলাদেশ নিয়ে সক্রিয় থাকেন কী করে? এই উৎসাহ আপনি পান কোথা থেকে?

আলী রীয়াজ : শারীরিকভাবে বিদেশে থাকি মাত্র। মানসিকভাবে বাংলাদেশেই থাকি। জন্ম নিয়েছি এখানে। জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলাদেশেই কেটেছে। বাংলাদেশ আমার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। এক সময় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে সব ঘটনা জানতে পারা এবং বুঝতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে।

একইভাবে বাংলাদেশ নিয়ে বেদনাও আছে। হয়তো বাংলাদেশ নিয়ে অন্য আলোচনা করতে পারলে আরও আনন্দ পাওয়া যেত।

ছবি : **কাজী তাইফুর**

২০ এপ্রিল ২০১৭ | সাপ্তাহিক
৫